নারীর অদৃশ্য শ্রম : স্বীকৃতি ও মর্যাদা

কর্মজীবী নারী ও সাধারণ গৃহিণী– উভয়েই গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত থাকেন দিনে ও রাতের একটা বড় সময়, যা সমাজে প্রায় উপেক্ষিতই থেকে যায়। এ কাজের সম্মান তো মেলেই না, এমনকি তার স্বীকৃতি দিতেও অসম্মত থাকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। ঘরে নারীর কাজের গুরুত্ব ও আর্থিক মূল্যায়ন করা হলে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্তন আসবে। নিশ্চিত করা সম্ভব হবে সমতা। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর আয়োজনে 'নারীর অদৃশ্য শ্রম : স্বীকৃতি ও মর্যাদা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়

অংশগ্রহণে
শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
কাবেরী গায়েন
শিক্ষক, সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর
শিক্ষক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুয়েল আইচ, জাদুশিল্পী
মঈনুল আহসান সাবের, সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০
বনশ্রী মিত্র নিয়োগী
কর্মসূচী সমন্বয়কারী, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
সানাউল আরেফিন, ম্যানেজিং পার্টনার, মাত্রা

দম্পতি
ডা. তারেক সালাহউদ্দিন-ডা. ইসরাত জাহান
জুটন চৌধুরী-স্নিগ্ধা রানী তপাদার

সঞ্চালক
মারুফ রায়হান, সহযোগী সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০

মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪
স্থান : ডেইলি স্টার সেন্টার, ঢাকা

মারুফ রায়হান : আজ আমরা এখানে খোলামেলা আলোচনা করব। এটা হবে অনেকটা আড্ডার মতো। বিষয়টি হচ্ছে 'নারীর অদৃশ্য শ্রম : স্বীকৃতি ও মর্যাদা'। নারীর শ্রম আবার অদৃশ্য কী? সব শ্রম তো দেখতে পাওয়া যায়। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমরা অনেকেই নারীর গৃহস্থালি বা বাইরে কৃষিকাজে দেয়া শ্রমকে দেখতে চাই না। আমরা নারীর এই শ্রমকে অদৃশ্য করে ফেলতে চাই। অথচ নারীর এই শ্রম কিন্তু বিরাট শ্রম। আমরা যদি নারীর এই শ্রমকে স্বীকৃতি দিতে পারি, মর্যাদা দিতে পারি তাহলে অর্থনীতিতে তাদের অবদান অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের আজকের এই আড্ডাটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর যৌথ আয়োজন। মূলতঃ উপস্থিত দুটি দম্পতির সংসার যাপনের চিত্র এবং তা পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে নারীর অদৃশ্য শ্রম এবং তার স্বীকৃতি ও মর্যাদার বিষয়টি বুঝে নিতে চাইব।

প্রথমে আমরা পূর্ণকালীন গৃহিণী স্নিগ্ধা রানী তপাদারের কথা শুনব। আপনি যদি আপনার প্রতিদিনের কাজের পরিধি বা কী কী কাজের মধ্য দিয়ে আপনার দিন কাটে, সে সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন।

স্নিগ্ধা রানী তপাদার : আমাদের পরিবারে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন, ছেলে-মেয়ে, শাশুড়ি মা, ননদ, ননদের ছেলে এবং আমাকে সহায়তা করার জন্য একটি মেয়ে আছে। আমার ছেলে-মেয়ে দুজনই স্কুলে যাচ্ছে। মেয়ের স্কুল মর্নিং শিফটে এবং ছেলের স্কুল ডে শিফটে। মেয়ের স্কুল সকাল সাড়ে ৭টায় হওয়ায় আমি ঘুম থেকে উঠি সকাল ৬টায়। ঘুম থেকে উঠে মেয়ের টিফিন এবং সকালের খাবার তৈরি করি। তারপর মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাই। স্কুল থেকে ফিরে আমি ৯টার মধ্যে সকালের খাবার তো বটেই, সেই সঙ্গে চেষ্টা করি পুরো দিনের খাবার তৈরি করে ফেলতে। এরপর সবাইকে খাবার দিই,

বিশেষত স্বামী অফিসে যায়, তাই ওর খাবারটা ওকে দিই। এরপর আমি চলে যাই মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে। স্কুল থেকে ফিরতে সাড়ে ১০টা বাজে। এসে মেয়েকে গোসল করাই, খাওয়াই। ১২টা নাগাদ ছেলের স্কুলে রওনা হই। ১টা নাগাদ আবার বাসায় ফিরে আসি। তখন ঘর গোছানো, রান্নার বাকি কাজ, নিজের স্নান করা– এসব কাজ করি। দুপুরে মেয়েকে খাওয়াই। শাশুড়ি মা বৃদ্ধ তাই ওনাকে খাওয়াতে হয়। ওনার বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খেতে হয়, সেগুলো সামনে দিই। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মেয়েকে একটু পড়াই। তারপর মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিই। হয়তো একটু পত্রিকা পড়ি, টিভি দেখি, গান শুনি। ৫টা সোয়া ৫টায় ছেলেকে আনতে স্কুলে চলে যাই। ছেলের স্কুল ছুটি হয় পৌনে ৬টায়, ছেলেকে নিয়ে বাসায় ফিরতে সাড়ে ৭টা বেজে যায়। বাসায় ফিরে ছেলেকে খেতে দিই। সন্ধ্যায় সবাইকে নাশতা দিই। সবসময় যদিও আমিই সব কাজ করি না। কাজের মেয়ে বা আমার ননদ আমাকে সাহায্য করে। নাশতার পর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসি।

মারুফ রায়হান : আমরা যারা বাইরে কাজ করি, তারা দিনে আট ঘণ্টা কাজকে পূর্ণদিবস কাজ মনে করি; কিন্তু আপনাকে তো প্রায় ১৬ ঘণ্টাই কাজ করতে হচ্ছে।

স্নিগ্ধা তপাদার : আমি অবশ্য কাজের মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে পারছি। কিন্তু যারা বাইরে কাজ করেন তাদের তো বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ থাকে না। ওদের পড়া হয়ে গেলে সবাই রাতের খাবার খাই, টিভি দেখি। ১০টায় ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। কখনো কখনো ও তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে, তবে বেশিরভাগ সময়ই ওর দেরি হয়। ১১টার মধ্যে হয় আমি ঘুমিয়ে যাই, নয়তো ওর জন্য অপেক্ষা করি। আমি ঘুমিয়ে গেলে ও নিজের মতো খেয়ে নেয়।

মারুফ রায়হান : ছেলে-মেয়েদের স্কুল তো ৫ দিন। বাকি দুদিন কি আপনি কাজ থেকে একটু ছুটি পান, না কাজের মধ্যেই থাকতে হয়?

স্নিগ্ধা তপাদার : আসলে আমার মেয়ের স্কুল ৫ দিন কিন্তু ছেলের স্কুল ৬ দিন। আর শুক্রবারে কাজ আরো বেশি থাকে। ও সারা সপ্তাহ অফিস করে, তাই বাজার করতে পারে না। দেখা যায় পুরো সপ্তাহ বা ১০-১৫ দিনের বাজার ওই একদিনেই করে। ছেলেমেয়েদের আর্ট, গানের স্কুলে যেতে হয়। সব মিলিয়ে মনে হয় শুক্রবারে কাজের চাপ একটু বেশি থাকে।

মারুফ রায়হান : মানে বলা যেতে পারে গৃহিণীদের কোনো ছুটির দিন নেই।

স্নিগ্ধা তপাদার : ওইভাবে দেখলে নেই।

মারুফ রায়হান : এবার আপনার স্বামীর দিকে ফিরি। জুটন চৌধুরী, জানলাম আপনি

> গৃহিণীরা বাসায় যে কাজ করেন, সেটার জন্য আমরা কোনো মূল্য দিতে পারি না। কারণ এটা আমাদের সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ স্ত্রীর কাজের জন্য তাকে পারিশ্রমিক দেয়ার বিষয়টি। কিন্তু তার এই শ্রমকে স্বীকৃতি দেয়া এবং স্বীকার করা যে বেতন দেয়া না হলেও এর একটা ভ্যালু আছে

১০টার আগে ঘরে ফেরেন না। আপনাকে অফিসের কাজ করতে হয়। কিন্তু আপনার স্ত্রী বা সাধারণভাবে গৃহিণীরা ঘরে যে কাজগুলো করছেন, সেজন্য তো সমাজে আমরা তাদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে পারি-নি বা পারি না। বা সমাজ সেটা করে ওঠেনি। কিন্তু তার যে শ্রমটা তিনি ঘরে দিচ্ছেন, আপনার কি মনে হয় না এই শ্রমকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত বা মর্যাদা নিশ্চিত করা উচিত?

জুটন চৌধুরী : সেটা তো অবশ্যই করা উচিত; কিন্তু আমরা কি সেটা করি বা করতে পারি? সবচেয়ে বড় কথা, আমি সব সময়ই অনুভব করি যে ও অনেক পরিশ্রম করে। এ কারণে শুক্রবার আমি চেষ্টা করি বাজার করার ফাঁকে ফাঁকে ছেলে-মেয়েকে তাদের আর্ট এবং গানের ক্লাসে সময় দেয়ার। তবে শুক্রবারেও অনেক সময় আমার পত্রিকা অফিসের অ্যাসাইনমেন্ট থাকে, তখন যেতে পারি না। তবে বাসায় থাকলে চেষ্টা করি সময় দেয়ার। ও পরিবারে যে সময়টা দেয়, আমি তা দিতে পারি না। মেয়ের স্কুল খুব সকালে, আমার যাওয়া উচিত কিন্তু ক্লান্ত থাকি তাই যেতে পারি না। ও কিন্তু ঠিকই মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন আজ সকালে মেয়ের রেডি হতে দেরি হয়ে গেছে। ওর মা চেঁচামেচি করছে, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি শুরু হলে রিকশা পাওয়া যাবে না।' তারপর আমার উদ্দেশে বলছে, 'শুনেও তো একটু সাড়াশব্দ নেই, মেয়েটাকে যে একটু রেডি করাবে, তাও ওঠে না।'

এটা সত্য যে, আমি ছেলে-মেয়েদের একটু ভালো খাওয়াতে পারি। আর আমি খাওয়ালে ওর একটু সাহায্য হয়। কিন্তু আমি সব সময় উঠতে পারি না। আর আমরা তো এক বা দুই ধরনের কাজ করি, হয় রিপোর্টিং বা অফিসে ডিউটি। আর ওর কাজ শুরু হয় ভোরবেলা আর শেষ হয় রাত ১১টায়। আবার আত্মীয় এলে আরো দেরি হয়। আমাদের আবার বারো মাসে তেরো পার্বণ। প্রতি মাসেই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান থাকে। আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় দাওয়াত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব দাওয়াতে ও-ই যায়। ওদের শ্রমের স্বীকৃতি আমরা দিতে পারিনি বা দিতে না পারলেও এটা ভালো বুঝি, আমাদের ঘরের মানুষগুলো অনেক পরিশ্রম করেন। যেমন একটা কথা বলে নিই যে, সন্ধ্যায় শিক্ষক এলে তাকে নাশতা দিতে হয়। এটাও ওর একটা কাজ।

মারুফ রায়হান : আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঘরের খাদ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি প্রধানত স্নিগ্ধাকেই করতে হচ্ছে। শাশুড়ির সেবাও করছেন। তার মানে তার অনেক কাজ। এখন চাইলে উপস্থিত অন্য আলোচকরা প্রশ্ন করতে পারেন।

শাহীন আনাম : আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

আপনাদের দুজনের কথা শুনে খুব ভালো লাগল। গৃহিণীরা বাসায় যে কাজ করেন, সেটার জন্য আমরা কোনো মূল্য দিতে পারি না। কারণ এটা আমাদের সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ স্ত্রীর কাজের জন্য তাকে পারিশ্রমিক দেয়ার বিষয়টি। কিন্তু তার এই শ্রমকে স্বীকৃতি দেয়া এবং স্বীকার করা যে বেতন দেয়া না হলেও এর একটা ভ্যালু আছে। আপনি যে বলছিলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠতে না পারায় বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যেতে পারেন না, আমার মনে হয় আপনি যদি অন্তত সপ্তাহে একদিন সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যান তাহলে আপনার স্ত্রী একটা দিন একটু দেরি করে উঠতে পারতেন। অবশ্য এটাও ঠিক, আপনিও সারাদিন কাজ করেন। তবে আপনি আপনার স্ত্রীর পরিশ্রমের বিষয়টি স্বীকার করছেন। এটা খুব ভালো ব্যাপার। আমি অনেক জায়গায় স্বামীকে বলতে শুনেছি, 'সারাদিন তো ঘরেই ছিলে, কী এমন কাজ করো?' এটা সমাজের একটা সাধারণ প্রচলিত কথা। আশা করি, আমরা ধীরে ধীরে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসব।

মারুফ রায়হান : স্নিগ্ধা কিন্তু বলতে পারছেন না যে আজ ভোরে তিনি উঠবেন না। তাকে যেতেই হচ্ছে বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে।

স্নিগ্ধা তপাদার : ভাবী যেটা বললেন, আপনি মাঝে মাঝে বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে আসতে পারেন। ও আসলে মাঝে মাঝে এটা করে। কিন্তু ওর কাজের ধরনটা এমন যে সারাদিন হয়তো ঘুরতে হয় বা রাতেও কাজ করতে হয়। তাই আমি চাই না ও সকালে ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাক। আমার শরীর খারাপ থাকলে বা আমি পারছি না বুঝলে ও নিজেই সেদিন বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে আসে।

মারুফ রায়হান : আমি এবার কাবেরী গায়েনের কাছে আসতে চাচ্ছি। আপনি তো এখানে একটি দম্পতির কথা শুনলেন। আমাদের দেশে এমন লাখ লাখ দম্পতি আছেন, যেখানে নারী সদস্য পূর্ণকালীন গৃহিণী। সব মিলিয়ে আমাদের সমাজের অবস্থান এবং গৃহিণীদের শ্রমদানের ব্যাপারে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমাদের কিছু বলেন...

কাবেরী গায়েন : আমার মা সারাদিন কাজ করতেন– এটা দেখে দেখেই আমরা বড় হয়েছি। আমরা স্কুল থেকে এসে সবার কাপড়-চোপড় আলনায় রাখাসহ আরো টুকিটাকি কাজ করতাম। আমার ভাইয়েরাও স্কুল থেকে আসত। আমিও আসতাম। কিন্তু আমিই ওদের বিছানা তৈরি করে দিতাম। ঘর ঝাড়ু দিতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক কাবেরী গায়েন ও রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর

শাহীন আনাম যেটা বললেন, সংসারে শেয়ারিংটা হলে অনেক সুবিধা হয়।

জুয়েল আইচ : উনি কিন্তু খুব সততার সঙ্গে সব কথা বলেছেন। এমনকি যখন আমরা কোনো প্রশ্ন করছিলাম না, তখন তিনি নিজে থেকেই বলছেন, আমি কিন্তু ব্রেক পাচ্ছি। আমার কাজে সাহায্য করার জন্য একটি মেয়ে আছে, আমি গান শুনছি। আবার তিনি যখন বললেন বাচ্চারা স্বামীর হাতে ভালো খায় তখন কিন্তু স্নিগ্ধা সেটা স্পষ্ট করে দিলেন, ও খুব ভালো খাওয়াতে পারে। মানে তাদের মধ্যে বেশ ভালো সমঝোতামূলক সম্পর্ক আছে। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যা করে। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। তার যারা অতিথি আসতেন, তাদের জন্য চা বানানো। এসব কাজ আমি ক্লাস ফাইভ-সিক্স থেকেই করছি। আমরা যেমন বাতাসের মধ্যে থেকে ভুলে যাই যে আমরা বাতাসের মধ্যে আছি ঠিক তেমনি... আমার দাদারা দূর থেকে আসতেন। তারা বলতেন– হ্যাঁ কাবেরী খুব ভালো চা বানায়, ও খুব ভালো কাপড় ধুতে পারে। এগুলো ছিল স্নেহের দাবি। বা আমার দাদা খেতে বসলে পাখা দিয়ে বাতাস করা; যদিও পাখার দরকার ছিল না কারণ ফ্যান ছিল। তারাও বোনকে খুব আদর করছেন। কিন্তু তারা যে বিশ্রামটা পাচ্ছেন, বোনরা সেটা পাচ্ছে না। আমার বড় বোনকে দেখতাম, তিনি তখন জাহাঙ্গীরনগরে পড়তেন। বাসায় ফিরেই ঘর পরিষ্কার করা, আরো নানা ধরনের কাজ করা শুরু করে দিতেন। তারপর নারীবাদী লিটারেচার পড়ে মাথায় অনেক কিছু জমে উঠল। তবে আমি সবচেয়ে বিস্মিত হলাম যখন আমি পিএইচডির গবেষণার জন্য সাত মাস বাংলাদেশের গ্রামে ছিলাম। আমার কাজ ছিল মেয়েদের রিপ্রোডাকটিভ খাত এবং কমিউনিকেশন চ্যালেঞ্জ। আমি ওই সময় দেখলাম গ্রামে নারী-রা প্রচুর কাজ করেন। তাদের কিন্তু কথা বলার সময় নেই। তারা কাঁথা সেলাই করছেন, ধানে পাড়া দিচ্ছেন; আরো অনেক কিছু। কিন্তু আমি যখনই তাদের বলছি কী করেন? তারা বলছেন কিছু না। তারা নিজেরাই জানেন না। তাদের স্বামীরা বলেন, আমার স্ত্রী কিছু করেন না। অথচ নারীরা মাছ ধরে নিয়ে আসছেন, স্বামীর সঙ্গে মাঠে গিয়ে ধান লাগাচ্ছেন, ধান মাথায় করে নিয়ে আসছেন, তারপরও তারা বলছেন তারা কিছু করেন না। এমনকি তারা কাঁথা সেলাই করেন, যে কাঁথা অন্যের বাড়িতে সরবরাহ করছেন এবং তখনো তারা বলছেন তারা কিছু করেন না। তখন আমি বুঝতে পার-লাম যে নারীরা টাকার বিনিময়ে কাজ করলেও ভাবছেন তারা কিছু করছেন না। আসলে দৃষ্টিভঙ্গিটাই এ রকম। অর্থনৈতিক দিকটি নিয়ে আলোচনার জন্য বন্ধু রাশেদ তিতুমীর আছেন। আমি বিষয়টির সামাজিক নির্মিতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, যিশু তার ক্রুশটি নিজের কাঁধে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বধ্যভূমিতে। ঠিক একইভাবে নারীরা দিনের পর দিন কাজ করছেন কিন্তু ভাবছেন তিনি কিছু করছেন না। পিতৃতন্ত্র নারীকে দিয়েই বলাচ্ছে তিনি কিছু করেন না।

জুয়েল আইচ : একদম ব্রেন ওয়াশ।

কাবেরী গায়েন : ঠিক তা-ই। আবার ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার মা কী করেন? উত্তর আসবে, আমার মা কিছু করেন না। অথচ মা-ই তাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। যেমনটা এখানেও আমরা শুনলাম। আর বাবা কী করেন, বাবা অমুক চাকরি করেন। প্রকৃতপক্ষে ওই সাত মাস গ্রামে থেকে আমি বুঝলাম, নারীরা কী পরিমাণ কাজ করেন এবং তারপরও নিজেরা বলেন তারা কিছু করেন না। তাদের স্বামীরা বলেন তারা কিছু করে না এবং সন্তানরাও বলে মা কিছু করেন না। স্পাইরাল সাইলেন্স নামে একটা তত্ত্ব আছে যেখানে বলা হয়, একই বিষয়ের ভেতর দিয়ে বার বার যেতে যেতে আমাদের মনে হয় সেটাই স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিকতার বর্মটি, এর বিচারের মানদ-টি যেটা দিয়ে আমাদের মনের কাঠামো তৈরি হচ্ছে, আমরা বিচার করছি, এটা কিন্তু একটা সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট। এই সোশ্যাল কনস্ট্রাক্টে নারী যে কাজই করুক না কেন, তার কোনো মূল্য

নেই। শুধু যে তাদের কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নেই তা নয়, মূল্য থাকলেও তারা ভাবছেন, তারা কিছু করছেন না। এখন তাহলে নারী কোন কাজ করলে এই স্টেরিওটাইপটা ভাঙবে বা তারা স্বীকৃতি পাবেন যে তারা কাজ করছেন। এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে, নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সাপোর্ট করলেও তিনি মনে করেন তিনি কিছু করছেন না, তার স্বামী মনে করেন তিনি কিছু করছেন না, তার সন্তানরাও এটা মনে করছে এবং সমাজও মনে করছে তিনি কিছু করছেন না। এই নেতিকরণ যে তিনি কিছু করছেন না– এটাই আমাদের মানস কাঠামো। একটা দুঃখজনক উদাহরণ দেব। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একটা ভাতা পান। রাষ্ট্র তাদের একটা ভাতা দিচ্ছে। যে দৈহিক নির্যাতনের স্বাক্ষর পুরুষকে মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দিয়েছে, সেই একই দৈহিক নির্যাতনের সাক্ষী হয়েও নারী কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হতে পারছেন না। তিনি রয়ে যাচ্ছেন নির্যাতিতা হিসেবে। এ নিয়ে আমার একটা বই আছে, সেখানে আমি এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এতে সমাজে তার স্থান আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। এই নির্যাতিত নারীদেরও যদি একটা ভাতা দেয়া হয়, তাহলে কিন্তু পরিবারে তার অবস্থানটা ভালো হয়। এই রাষ্ট্রের জন্মের কারণেই যে তার ওপর ইতিহাসের এই অমোঘ নির্যাতন নেমে এসেছিল, মুক্তিযুদ্ধে তার যে অবদান সেই স্বীকৃতিটাও তিনি পাননি। তিনি যদি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাতা পান, সার্টিফিকেট পান তাহলে কিন্তু সমাজে তার অবস্থানটা উন্নত হয়। দরকার মর্যাদা ও স্বীকৃতি। অর্থনৈতিকভাবে যতক্ষণ কেউ মূল্যায়িত না হন ততক্ষণ তার মর্যাদার জায়গাটি খুব ভাসমান থাকে, কেউ দিলে তার মর্যাদা হয়, না দিলে মর্যাদা হয় না। যে ছেলে-মেয়ে মনে করছে তার মা কাজ করছে তার কাছে মা মর্যাদা পাচ্ছে। আর যারা মনে করছে মা কাজ করছে না। তাদের কাছে মা মর্যাদা পাচ্ছে না। তাহলে আমরা এ অবস্থা কীভাবে ভাঙব? আমাদের মানস কাঠামোতে আমরা জানি, নারী কাজ করছেন না। কারণ তার কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নেই। অর্থনৈতিক মূল্য নেই বলে না আছে তার কাজের স্বীকৃতি, না আছে মর্যাদা।

মারুফ রায়হান : কাবেরী গায়েনের শেষ কথাটির সূত্র ধরে রাশেদ তিতুমীর যদি নারীর এই অদৃশ্য শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন তবে ভালো হয়।

রাশেদ তিতুমীর : কাবেরী যে কথাগুলো বললেন, সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অনেক দোষ দিতে পারেন বিশেষত আমরা যারা অর্থশাস্ত্র পড়াই বা পড়ার চেষ্টা করি। কারণ এখনো যেসব বিষয় পড়ানো হয় তাতে নারীর এই অবদান বা এ বিষয় সম্পর্কে কিছু নেই। আপনারা যদি দেখেন, ছোটবেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যে পাঠ হয় সেখানে কিন্তু এই কর্মের বিভাজন সম্পর্কে কিছু নেই। অর্থাৎ বলা যায়, স্বীকৃত কোনো পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় না। এখন যারা প্রতিবাদী নারী বা প্রতিবাদী জ্ঞানের চর্চা করেন, তারা এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার চেষ্টা করছেন। এটা একটা বিরাট কাজ এবং অনেকে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এখনো জাতিসংঘ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারপর বিভিন্ন দেশ সেগুলো করে। এটাকে আমরা বলি এসএনএ অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড অব ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা অন্য দেশগুলো একইভাবে কাজ করে। এখানে আমরা তিনটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছি। প্রথম হচ্ছে বিদ্যায়তনিক শিক্ষা এটাকে কোনোভাবে উৎসাহিত করে না বা এটার চল নেই। দ্বিতীয় বিষয়টা হলো যেহেতু এটা নতুন তাই এটা নিয়ে সর্বসাধারণ গ্রহীতার কোনো সিদ্ধান্ত নেই। অর্থাৎ এই কায়দায় কাজটা করা যায় এমন কোনো নির্দিষ্ট কিছু নেই। তৃতীয়ত, আপনার এ কাজটি যারা করবেন তারা অদৌ কাজটি করতে চাচ্ছেন না। যেমন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। এ কাজ করা তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তবু আমরা চিন্তা করলাম, অন্তত বিতর্ক হওয়া দরকার। আমরা গত বছর একটা জরিপ করি, ছোট আকারে কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে এটা ঠিক আছে। আমরা ৫২০ নারীর ওপর জরিপ করি। যেখানে শহর এলাকা থেকে নেয়া হয়েছে ৩১৮ এবং গ্রাম এলাকা থেকে ২০২ জন নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আদমশুমারিতে যেসব তথ্য ব্যবহার করে, সেসব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ভাগ করেছি এবং চেষ্টা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, এ বিষয়ে যেসব কাজ হয়েছে সে কাজে সবাই দুধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। একটা হলো আয়ভিত্তিক পদ্ধতি এবং অন্যটি হলো ব্যয়ভিত্তিক পদ্ধতি। আয়ভিত্তিক পদ্ধতি বলতে বোঝায় সুযোগ-খরচ পদ্ধতি। অর্থাৎ তিনি নারী হিসেবে যে কাজ করছেন সে সময়টাতে যদি তিনি কোনো আয় করতেন তাহলে সেটা কত টাকা হতো। আরেকটা হলো মার্কেট রিপ্লেসমেন্ট মেথড। এ পদ্ধতিতে দেখা হয় ওই সময় কাজটি অন্যকে দিয়ে করাতে আমার কত টাকা খরচ হতো। এ দুটি পদ্ধতি দেখে আমাদের প্রাক্কলন হলো নারীর এ কাজের মূল্য মোটা দাগে এক লাখ কোটি টাকা। এটাকে যদি আমরা মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির হিসাব করি তাহলে মোটা দাগে দাঁড়ায় ১০ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ। আমি ব্যক্তিগতভাবে বা আমাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছি, এটা কম হবে। কম হবে এ কারণে যে, আমাদের সমাজে নারী শ্রমিকের বেতন কম। যেহেতু নারী শ্রমিকের বেতন কম সেহেতু আয়ভিত্তিক হিসাব করলে সেটা কম হবে। আবার ব্যয়ভিত্তিক করলে সেটাও কম হবে। অর্থাৎ গোড়াতেই একটা সমস্যা আছে, যেটা কাবেরীও বলেছেন। শ্রমিক হিসেবে নারীকে আপনি যেভাবে ভাবছেন, সেখানেই একটা সমস্যা রয়েছে। তাই মনে করি, এ বিষয়ে আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে।

মারুফ রায়হান : ধন্যবাদ। আপনি যে হিসাবটা বললেন, এক লাখ কোটি টাকা, সিপিডি কিন্তু গত মার্চ মাসে একটা হিসাব দিয়েছে, সেটাও খসড়া। সেখানে বলা হয়েছে ছয় হাজার নয়শত একাশি কোটি থেকে নয় হাজার একশ তিন কোটি ডলার, যেটা টাকায় হিসাব করলে দাঁড়ায় সাত লাখ কোটি টাকা। আপনাদের হিসাব থেকে সাতগুণ বেশি হচ্ছে।

অংশগ্রহণকারী দম্পতি জুটন চৌধুরী ও স্নিগ্ধা রানী তপাদার

শাহীন আনাম : ওরা যে গবেষণাটা করছে, সেটা এখনো শেষ হয়নি। ওরা তেরো হাজার রেসপন্ডেন্ট নিয়ে কাজ করবে। পুরো দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকবে সেখানে। আর এটা ছিল একজিস্টিং লিটারেচার রিভিউ করে তৈরি হিসাব।

(বাকি অংশ আগামী সংখ্যায়)